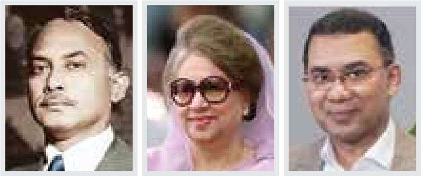

- গৌরবোজ্জ্বল অতীত
- সংগ্রামী বর্তমান
- আগামীর প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

শিক্ষা-ঐক্য-প্রগতি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

গৌরবোজ্জ্বল অতীত
সংগ্রামী বর্তমান ও আগামীর প্রতিশ্রুতি

প্রকাশকাল
৪ কার্তিক ১৪৩১
২০ অক্টোবর ২০২৪

শিক্ষার্থীদের প্রতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্রতিশ্রুতি:

- বাংলাদেশের সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষ, বাংলাদেশে বসবাসরত নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহ সহ সকল জাতি-গোষ্ঠী ও মানুষের চিন্তা-চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারসম্পন্ন, জনকল্যাণমূলক, সহিষ্ণু, মানবিক, শান্তিকামী ও সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন।

- দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতিতে দেশবিরোধী আধিপত্যবাদী শক্তির হীন অপচেষ্টা রুখে দিয়ে শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের প্রকৃত মালিকানা ফিরিয়ে আনা।

- শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে একটি মানবিক, সহিষ্ণু, ন্যায়ানুগ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক সমাজ সৃষ্টির সঠিক ও যথাযথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

- একটি প্রশিক্ষিত, উৎপাদনশীল ও কর্মমুখী তরুণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা।

- মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষিত তরুণদের চিন্তার জগতে পরিবর্তন করা। সার্টিফিকেট নির্ভর পড়ালেখার বিকল্প হিসেবে কর্মমুখী শিক্ষায় মনোনিবেশিকরণে তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা।

- জাতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহিত করা।

- রাষ্ট্রগঠন ও রাজনীতিতে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বাঁধা দূরীকরণে ভূমিকা রাখা।

- মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে জনমত গড়ে তোলা এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া।

- রাষ্ট্রের উচ্চস্তরে গণতান্ত্রিক চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশের সকল বিদ্যাপীঠে গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে হবে। মুক্ত রাজনৈতিক চর্চার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলোকে নিয়মিত করতে হবে। ছাত্রদল এসকল জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিতকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর 'আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'আমাদের জাতীয়তাবাদ পৃথিবীর অন্যান্য জাতীয়তাবাদী চেতনার থেকে আলাদা। আমরা খণ্ডিত চেতনায় বিশ্বাসী নই। আমাদের জাতীয়তাবাদ সার্বিক। এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের জাতিগত চেতনা, দেশ ও ভাষার ঐতিহ্য, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আঞ্চলিকতাবোধ, অর্থনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা। সর্বোপরি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দীর্ঘদিনের সংগ্রামের উন্মাদনা।' শহীদ জিয়া বিশ্বাস করতেন, কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর পরিচয় জ্ঞাপক নাম হচ্ছে জাতি। উক্ত জাতির আচার-আচরণ, চলনরীতি, আনন্দ-বেদনা এবং ধর্মবিশ্বাসের ঐক্যনিহিত প্রকাশই হলো জাতীয়তা। আর এমন প্রাকৃত জাতির মনের ভাব ও ভাবাবেগ প্রকাশ হলো জাতীয়তাবাদ।

ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা:

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণকে এক পতাকাতলে এনে জাতি গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা ও আদর্শে জনগণের মধ্যে ইস্পাত ঐক্য গড়ে তোলা এবং জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অগ্রগতি, আত্ম-নির্ভরশীলতা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি প্রথমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধকরণের এই প্রক্রিয়ায় জিয়া এদেশের ছাত্র ও যুবসমাজ, কৃষক, শ্রমিক সহ সকল পেশার মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএনপি'র কিছু অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরই একটি সফল প্রতিফলন হচ্ছে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের কাছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আদর্শিক রাজনীতিকে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১লা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেন। ধানমন্ডিতে অবস্থিত বিএনপির তৎকালীন কার্যালয়ে কাজী আসাদুজ্জামানকে আহবায়ক করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১০১ সদস্যবিশিষ্ট প্রথম আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে ছাত্রদলের কার্যালয় নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়।

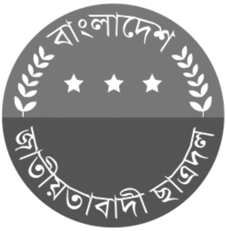

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মনোগ্রাম

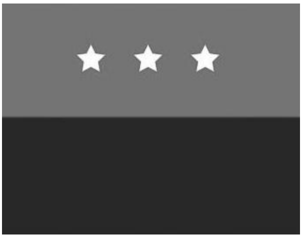

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পতাকা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠনকালে ন্যাপ (মশিউর) এর ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্রদল, ইউপিপির একাংশের সমর্থিত ছাত্র ইউনিয়ন, জাগদলের ছাত্র সংগঠন জাগ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও মুজিববাদী ছাত্রলীগের অনেকেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলে যোগ দেয়। ছাত্রদলের প্রথম আহবায়ক কাজী আসাদুজ্জামানও মুজিববাদী ছাত্রলীগ থেকেই এসেছিলেন। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠাকালে বাম সংগঠনসমূহের অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছাত্রদলে যোগদান করে। জিয়া চেয়েছিলেন, ছাত্রদল গড়ে উঠবে ভিন্ন ছাঁচে। সকল মত ও পথের সম্মেলনস্থল হবে ছাত্রদল। একটি মুক্ত গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্য দিয়ে সংগঠন পরিচালিত হবে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই নীতিকে ধারণ করে একটি বহুত্ববাদী, শিক্ষার্থীবান্ধব ও গণমুখী রাজনৈতিক চর্চাকে প্রাধান্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রতিষ্ঠার পেছনের গল্প:

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার সাথে-সাথেই বাংলাদেশের রাজনীতির আকাশ অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে শুরু করে। শেখ মুজিব বিরোধী মত দমনে রক্ষিবাহিনী সৃষ্টি করেন। এই বাহিনীটির প্রধান কাজ ছিল বিরোধী মতামতকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা। রক্ষীবাহিনীর হাতে তৎকালীন বিরোধী মত ও দলের প্রায় ত্রিশ হাজার নেতাকর্মী নিহত হয়। শেখ মুজিবের শাসনামলেই বাংলাদেশে প্রথম বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটে। ১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারি সিরাজ শিকদারকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের পর শেখ মুজিব জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে দম্ভভরে উচ্চারণ করেছিলেন, 'কোথায় আজ সিরাজ শিকদার!' দূর্নীতি, দুঃশাসন, লুটপাট, দুর্ভিক্ষ আর রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ক্রমশই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল। ১৯৭৩ সালের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হাইজ্যাক, ব্যালট বাক্স ছিনতাই সহ ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে হয়। এর ফলে সৃষ্ট গণ অসন্তোষের কারণে

আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে নিজের ক্ষমতাকে নিরাপদ করতে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি ‘বাকশাল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শেখ মুজিব দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

মুজিবের এই দুঃশাসনে রক্ষিবাহিনীর মতোই লাঠিয়াল বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল মুজিববাদী ছাত্রলীগ। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রক্তপাতের রাজনীতি শুরু করে ছাত্রলীগ। চাঁদাবাজি, লুটতরাজ, খুন, ধর্ষণের মতো অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে সংগঠনটি। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় নকলের সয়লাব ঘটানো হয়। ইতিহাসে এই পরীক্ষাটিকে ‘গণ টোকাটুকি’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাবা, মা, সন্তানেরা একসাথে নকলের মহোৎসবে যোগ দিয়ে এসএসসি সার্টিফিকেট অর্জন করে। প্রশাসনিক কাঠামোতে দুর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির পসরা সাজানো হয়। এই সময়ের আলোচিত বিষয় ছিলো ‘তোফায়েল ক্যাডার’। অর্থাৎ তৎকালীন ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের সুপারিশেই কেবল প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হয়।

আমি জিয়া বলছি
আনন্দ উদ্বেল মানুষের
ঢল নেমেছিল

ছবি: সিপাহী জনতার বিপ্লবে জিয়াউর রহমানকে ঘিরে জনতার উল্লাস

দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যখন এমন দুর্নীতি, অপশাসন আর অরাজকতা বিদ্যমান, তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের শ্যেনদৃষ্টিও ছিল আশঙ্কাজনক। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে মেনে নিতে পারেনি ভারত। তাই স্বাধীনতার পর থেকেই তারা চেয়েছিল বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে রূপান্তর করে একটি করদরাজ্যে পরিণত করতে। এমনই অস্থির সময়ের মধ্যে ঘটে যায় কয়েকটি অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর দেশপ্রেমিক সিপাহী-জনতা জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে।

রাষ্ট্রভার গ্রহণ করে জিয়া অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ষড়যন্ত্র এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে নিরাপদ একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জিয়ার এই ভাবনা থেকেই বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তির উত্থান। সময়ের অনিবার্যতাকে ধারণ করে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের মেধাবী তরুণ প্রজন্মকে দেশাত্মবোধে বলীয়ান করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের অমর নায়ক,

স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)- এর ভাবনা থেকেই জন্মলাভ করে ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল’।

অনেকে মনে করেন, ১৯৭৮ সালের ২৬শে অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটা একটি ঘটনা জিয়ার মনে দাগ কেটেছিলো। সেদিনের ঘটনাটি ছাত্রদল প্রতিষ্ঠায় জিয়ার ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। জিয়া সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে শিক্ষক, অভিভাবক, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিনেট সদস্যদের একটি সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। তার আগমনকে কেন্দ্র করে মুজিববাদী ছাত্রলীগের কিছু সদস্য কালো পতাকা প্রদর্শন ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জিয়ার আগমন প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছিল। তার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গুলি চালানোর অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু জিয়া সেই অনুমতি দেননি; বরং তিনি বিচলিত না হয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে একাই বিক্ষোভকারীদের দিকে এগিয়ে যান। জিয়াকে এগিয়ে আসতে দেখে বিক্ষোভকারীদের অনেকেই সটকে পড়ে। উপস্থিত বাকিদের কাছে জিয়া তাদের চাওয়াপাওয়া প্রসঙ্গে জানতে চান; কিন্তু তারা কোনো সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। ঘটনাটি ছিলো অভূতপূর্ব। জিয়াকে সেখানে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা জিয়ার সাহসিকতা, মহানুভবতা এবং পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। গুটিকয়েক ছাত্রছাত্রীর সেদিনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিপরীতে জিয়ার সেই মানবিক আচরণ ও সংযম সকলের কাছে প্রশংসিত হয়।

দেশপ্রেমিক ও আধিপত্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার অংশ হিসেবে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গঠনে জিয়ার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনা বেশ প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় দর্শন ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’, বহুদলীয় গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার ভিত্তিক শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে ছাত্রদল বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ছাত্র ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (২৬ অক্টোবর, ১৯৭

ছবি: টিএসসিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান

জাতীয় রাজনীতির ক্রান্তিকাল:

রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জিয়ার দেশপ্রেম ও সততার শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে এদেশের সর্বস্তরের জনগণ বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের রাজনীতির ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের এমন উত্থান আধিপত্যবাদী শক্তি মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা তাদের এদেশীয় দোসরদের মাধ্যমে জিয়াকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এই ষড়যন্ত্রে অংশ নেয় কতিপয় বিপথগামী সেনা সদস্য। ছাত্রদল প্রতিষ্ঠার মাত্র আড়াই বছরের মাথায় ১৯৮১ সালের ৩০শে মে জিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন।

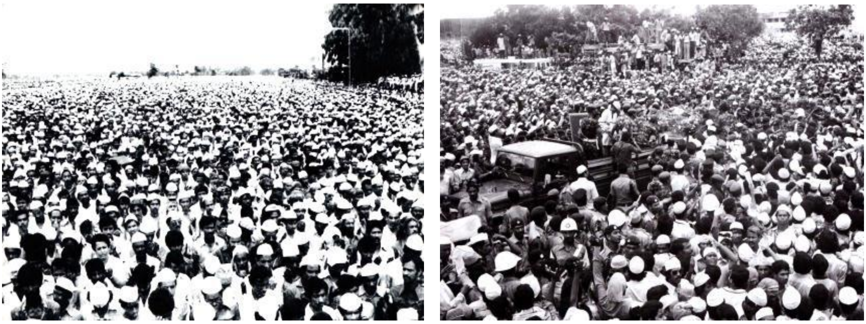

ছবি: শহীদ জিয়া'র জানাযার নামাজে জনতার ঢল

শাহাদাত বরণের আগে জিয়া একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছিলেন। মাত্র চার বছরে জিয়া বাংলাদেশের খোলনলচে পাল্টে দেন। বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া থেকে উদ্ধার করেন। জিয়া শক্ত হাতে সকল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেছিলেন। তিনি উনিশ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও উৎপাদনমুখী রাষ্ট্রে রূপান্তরের সূচনা করেন। আন্তর্জাতিক বিশ্বে ভাবমূর্তি সংকটে থাকা বাংলাদেশকে তিনি বিশ্বের দরবারে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হন। অল্প ক'দিনেই তিনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অসংখ্য বন্ধু তৈরি করতে সক্ষম হন। বাংলাদেশে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি. মাইলাম মন্তব্য করেছিলেন, 'এটা কল্পনা করাও কঠিন যে, জিয়া যদি ১৯৮১ সালের পরিবর্তে ১৯৭৫ সালে নিহত হতেন তাহলে বাংলাদেশের ভাগ্যে কী ঘটতো! বাংলাদেশ খুব সহজেই আফগানিস্তান বা লাইবেরিয়ার মতো একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারতো। জিয়া সেই পরিণতি থেকে বাংলাদেশকে বাঁচিয়েছেন।'

ছাত্রদলের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা : নব্বইয়ের গণ আন্দোলন

জিয়ার শাহাদাত বরণের পর বাংলাদেশের অগ্রগতিতে ছেদ পড়ে। বাংলাদেশ আবারও গভীর সংকটে পতিত হয়। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুশাসনের সকল ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ পদদলিত হতে শুরু করে। বিশেষ করে, স্বৈরাচারী এরশাদ তার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকা সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়। এরই অংশ হিসেবে এরশাদ সরকার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

জাতির সেই ক্রান্তিলগ্নে দেশের প্রতিবাদী জনতা ফুঁসে উঠে। স্বৈরাচারী এরশাদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সকল ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল প্রতিবাদ জানায়। বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষও এতে যোগ দেয়। স্বৈরাচার মোকাবিলায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি হয়। রাজনৈতিক দলগুলো ৩টি জোটে ঐক্যবদ্ধ হয়। পাশাপাশি ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যেও দু'টি জোট গড়ে ওঠে- সংগ্রামী ছাত্র জোট ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। আন্দোলন আরও জোরদার করতে ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মী শহীদ নাজির উদ্দিন জেহাদের মরদেহ সামনে রেখে ২৪টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গড়ে ওঠে।

ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে ছাত্রদের মধ্য থেকে দাবি উঠে আসে জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের স্বার্থের বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। সে আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করেই সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে ১০ দফা ঘোষণা করা হয়। পাঁচ পৃষ্ঠার এই দাবিনামাকে দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের একটি সুনির্দিষ্ট লিখিত নির্দেশনা বলা যায়। দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের স্বার্থের বিষয়গুলোকে এই দাবীনামায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। ভূমিহীন খেতমজুর, শ্রমিক-কর্মচারী, ব্যবসায়ী-আমলা, নারী-শিশু সহ সমাজের নানা স্বার্থের মানুষদের বিষয়াবলী ১০ দফায় তুলে ধরা হয়। রাজনৈতিক দল, সরকার পদ্ধতি ও পরিবর্তন, আইন-বিচার-শাসন বিভাগের ক্ষমতা, সংবাদপত্র, বাকস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-পরিবেশ-সমাজ-অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত দীর্ঘ সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী শক্তির অনড় অবস্থান দেশের জনসাধারণের কাছে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছিল।

ছবি: নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদলের মিছিল

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে ক্যু করে। এরশাদ বন্দুকের নলের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অপসারণ করে। স্বৈরাচারী এরশাদের সেই অবৈধ ক্ষমতা দখলকে স্বাগত জানিয়েছিল আওয়ামী লীগের তৎকালীন মুখপত্র 'দৈনিক বাংলার বাণী'। পত্রিকাটি এরশাদের ক্ষমতা দখলের পরদিন সকালেই 'একটা গুলিও ফোটে নাই, এক ফোটা রক্তপাতও হয় নাই; হে সামরিক শাসক, তোমায় অভিনন্দন!' শিরোনামের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদের দোসর হিসেবে নিজের অবস্থান প্রকাশ করে। কেবল তাই নয়, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা বিবিসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এরশাদের ক্ষমতা দখল প্রসঙ্গে বলেন, 'আই অ্যাম নট আনহ্যাপী।' অর্থাৎ আওয়ামী লীগ তার ঐতিহাসিক চরিত্র তথা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের যে বৃত্ত সেটার মোহ কাটাতে পারেনি। এরশাদের অবৈধ ক্ষমতা দখলের প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারের দোসর হিসেবে পাশে থেকেছে। এরই প্রতিফলন হচ্ছে ১৯৮৬ সালের নির্বাচন।

গণতন্ত্রমনা দলসমূহের নির্বাচন বয়কটের মাঝে শেখ হাসিনা এই নির্বাচনে এরশাদকে সহযোগিতা করে। অথচ ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের আগে চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দানে শেখ হাসিনা এই নির্বাচনে যে অংশ নেবে সে জাতীয় বেইমান হিসেবে আখ্যায়িত হবে- বলে ঘোষণা দিয়েছিল।

অপরদিকে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এরশাদের পাতানো সেই নির্বাচনে অংশ নেয়নি। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকই বেগম খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্তকে অদূরদর্শী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, তারা ভুল ছিলেন। বরং আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে অংশ নিয়ে জাতির সামনে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে হাজির হয়। পরবর্তীতে ঠিকই তারা এরশাদের সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

১৯৮২ সালের ৩ জানুয়ারি রাজনীতিতে নাম লিখিয়ে অল্পদিনেই নিভৃতচারিণী বেগম খালেদা জিয়া রাজপথের দুর্বার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শুরু করেন। ১৯৮৩ সাল থেকে স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি রাজপথে জনতার কাতারে নেমে এসে নেতৃত্ব দেন। তার নেতৃত্বে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনসমূহ এরশাদের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। নব্বই দশকের সেই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অনেকেই সমঝে চলার নীতি গ্রহণ করলেও বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি কোনো আপোষ করেননি। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষ তাকে 'আপোষহীন নেত্রী' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি একাধিকবার স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের রোষানলে পড়েন। তাকে মোট চারবার আটক করা হয়। কিন্তু তিনি দমে যাননি। সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য তিনি সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বারবার দীপ্তি ছড়িয়েছেন। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ছাত্র-জনতার তুমুল আন্দোলনের মুখে স্বৈরাচার এরশাদ ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হয়।

ছবি: নব্বইয়ের গণআন্দোলনে রাজপথে আপোষহীন বেগম খালেদা জিয়া। উল্লেখ্য যে, আন্দোলনরত দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া'কে রাজপথ থেকেই চারবার গ্রেফতার করা হয়।

৯০ এর সেই স্বৈরাচার বিরোধী ঐতিহাসিক আন্দোলনে দেশের ছাত্রসমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। দেশের কতিপয় রাজনৈতিক শক্তি যখন স্বৈরাচারী এরশাদের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগসাজশ করে চলছিল, সেই সংকটকালে সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে ছাত্রদল স্বৈরাচার হটানোর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিল। সংগ্রামের সেই দিনগুলো ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর ও বিপজ্জনক। সামরিক শাসক সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। সভা, সমাবেশ, মিছিলের মতো সব ধরণের নাগরিক অধিকার দমন করা হতো। রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপর সমানতালে চলেছিল দমন-পীড়ন, হামলা-মামলা, হত্যা, গুম, নির্যাতন। বিপদসংকুল সেই পরিস্থিতিতে আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা

জিয়ার অনুপ্রেরণা এবং অভিভাবকত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মরণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। '৯০ এর চূড়ান্ত আন্দোলনের আগে স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে টানা নয় বছর আন্দোলন করতে হয়েছিল। সে আন্দোলনে শতাধিক ছাত্র-জনতা প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে হত্যা করা হয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অন্যতম সেরা সংগঠক মাহবুবুল হক বাবলু সহ আরও দুইজনকে। গুম এবং পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন অসংখ্য মানুষ। জাতীয়তাবাদী কাফেলার অসংখ্য তরুণ শিক্ষার্থী সেই দীর্ঘ আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এখনো তারা সেই ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছেন। তবে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারের পতন ঘটেছিল। গৌরবের বিষয় এই যে, স্বৈরাচার পতনের এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে সমগ্র ছাত্রসমাজের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রতিনিধিত্বকারী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই আন্দোলনের অগ্রভাগে ছিল। এরই একটি ইতিবাচক ফলাফল হচ্ছে দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নিরঙ্কুশ বিজয়। বিশেষ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে (ডাকসু) আমান-খোকনের নেতৃত্বে পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ স্বৈরাচার পতন আন্দোলনে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে ছাত্রদলের প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থনের স্মারক বহন করে। এর আগে ১৯৮৯ সালের ডাকসু নির্বাচনেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ইতিবাচক ফলাফল করে। দুদু-রিপনের নেতৃত্বে ছাত্রদলের প্যানেলের নিশ্চিত বিজয়কে স্বৈরাচারী এরশাদের ইন্ধনে এবং কতিপয় দালাল ছাত্র সংগঠনের যোগসাজশে পাল্টে দেয়া হয়। তবে অধিকাংশ হল সংসদে ছাত্রদল ভালো ফলাফল করেছিল। শাসকগোষ্ঠী মূলতঃ সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে ছাত্রদলের তুমুল জনপ্রিয়তাকে ভয় পেয়েছিল। ছাত্রদলের এই উত্থানের গতিরোধ করতেই '৮৯ এর ডাকসু নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নেয় ছাত্রলীগ। তবে ছাত্রদলের অগ্রযাত্রাকে থামানো যায়নি। পরবর্তী নির্বাচনেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

১৯৯০ সালের ৬ জুন অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের হয়ে ভিপি পদে আমানুল্লাহ আমান, জিএস পদে খায়রুল কবির খোকন এবং এজিএস পদে নাজিমউদ্দিন আলম বিজয়ী হন। ডাকসু কেন্দ্রীয় নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ের পাশাপাশি ছাত্রদল ১৪টি হল সংসদের মধ্যে ৯টি তে জয় লাভ করে। আটটি হল সংসদ ছিলো- হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, মাস্টারদা সূর্যসেন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম) হল, শেখ মুজিবুর রহমান হল, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক হল, স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল।

ডাকসুতে জয়লাভের আগে ২৮শে মার্চ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদে (জাকসু) ১৬টি পদের সবগুলোতে জয়লাভ করে।

ছবি: ৯০'র ডাকসু নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিজয় মিছিল

এছাড়াও রাকসু, ইউকসু, বাকৃবি সহ ঢাকা কলেজ, বিএম কলেজের মতো বাংলাদেশের অধিকাংশ কলেজসমূহের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। ছাত্রদলের প্রতি দেশের ছাত্রসমাজের এই আস্থা ও বিশ্বাস স্বৈরাচার বিরোধী ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানকে বিপুল উদ্দীপনায় বেগবান করে তোলে। মূলতঃ স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ছাত্রদলের ভূমিকাই ছিলো অগ্রগণ্য। নব্বইয়ের গণ অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্র বিকাশের একটি মাইলফলক হিসেবে ধরা হয়। ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সাথে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে ছাত্রদলঃ

নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে পরবর্তী সময়েও অক্ষুণ্ন রেখেছে ছাত্রদল। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া এ সংগঠনটি সবসময় গণতন্ত্রকেই সাংগঠনিক রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছে। একটি বৈষম্যবিহীন সামাজিক ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নির্বিঘ্ন রাখতে ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মী প্রাণ দিয়েছে; গুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে; অত্যাচারী শাসকের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও ছাত্রদল কখনো দেশপ্রেম ও গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে পিছু হটেনি।

ছাত্রদলের রাজনৈতিক চেতনার মর্মবাণী হচ্ছে, আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রের হাত থেকে দেশকে নিরাপদ রেখে একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েম রাখা। মহান

মুক্তিযুদ্ধে যে চেতনা নিয়ে এ ভূখণ্ডের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করেছিল, সে চেতনা তথা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ছাত্রদল সর্বদা নিয়োজিত থেকেছে। সচেতন ছাত্রসমাজ এবং ব্যাপক অর্থে দেশের আপামর জনসাধারণের এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারায় শিক্ষার্থীমহলে ছাত্রদল একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। দিনে দিনে ছাত্রদলের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে এবং সময়ের ব্যবধানে সংগঠনটি উপমহাদেশের বৃহত্তম ও সর্বাধিক জনপ্রিয় ছাত্র সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষকে একসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করে রাখার মূলমন্ত্র তথা ‘বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ’ দর্শনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ছাত্রদল দেশপ্রেমিক সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপৃত রয়েছে। ছাত্রদলের উক্ত আদর্শিক অবস্থান এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য সংগঠনটিকে আরও অধিকহারে ছাত্রসমাজের প্রত্যাশার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। কেবল ছাত্রসমাজই নয়; বরং দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষও তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে দাবী আদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে ছাত্রদলের প্রতি আস্থা রেখেছে। নব্বইয়ের সফল আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্রদলও সাধারণ মানুষ ও ছাত্রসমাজের প্রত্যাশা পূরণে সদা সচেষ্ট থেকেছে।

নব্বইয়ের সফল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের পর ২০০৭ সালে এসে বাংলাদেশের গণতন্ত্র আরও একবার ধাক্কা খায়। সমঝোতার সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ সহিংস রাজনীতিতে লিপ্ত হয়, যার বলী হয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নামে সেনাসমর্থিত একটি অনির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে। অতীতের মতো এবারেও শেখ হাসিনা অনির্বাচিত এই সরকারকে স্বাগত জানায়। ‘এই সরকার আমাদের আন্দোলনের ফসল’- উক্তির মাধ্যমে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর দোসর হিসেবে নিজের পরিচয় পুনর্ব্যক্ত করে।

বিরাজনীতিকরণের আধিপত্যবাদী নীলনকশা অনুসরণ করে দুই বছরকালের মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকার রাজনীতিবিদদের উপর চড়াও হয়। বিশেষ করে, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের আদর্শ ধারণকারী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তিকে তারা মূল লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে। এরই অংশ হিসেবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও

তার দুই পুত্রসন্তান তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমানকেও গ্রেফতার করা হয়। আধিপত্যবাদী শক্তি এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের আসল লক্ষ্য ছিলো জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী শক্তির মনোবল ভেঙে দেওয়া। তাই তারা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু জিয়া পরিবারের সদস্যদের উপর খড়গহস্ত হয়। বেগম খালেদা জিয়াকে দেশত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগ করার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক দেশনায়ক জনাব তারেক রহমানের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালায়। তারেক রহমানকে ঘিরে দেশের তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে ভয় পেয়ে তারা তাকে একেবারে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো একটাই- বাংলাদেশ থেকে জাতীয়তাবাদী শক্তির বিনাশ। কিন্তু তীব্র দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী মূল্যবোধ ধারণ করা বেগম খালেদা জিয়া ও জনাব তারেক রহমান আপোষ করেননি। মা, মাটি ও মানুষের অধিকারের প্রশ্নে শত নির্যাতনের মুখেও তারা বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি।

ছবি: কারামুক্ত হয়েই ১/১১ সরকারের অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার তারেক রহমানকে দেখতে পিজি হাসপাতালে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া

মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশে মুক্ত রাজনীতির সকল দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়। একটি সীমিত কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে ভেঙে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অপচেষ্টা শুরু হয়। উপরন্তু সেনাসমর্থিত সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে কিছু ‘কিংস পার্টি’ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাজনীতিতে প্রকৃত রাজনীতিবিদসহ শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মহল এবং ছাত্রসমাজের অংশগ্রহণকে কণ্টকাকীর্ণ

করে তোলা হয়। গ্রেফতার, নির্যাতন, নিপীড়নের মুখে পড়ে অসংখ্য ছাত্রনেতার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অনেককেই ফেরারি জীবন বেছে নিতে হয়। রাজনীতির সেই ভয়ানক সংকটকালে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। সেনাসমর্থিত মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রথম প্রতিবাদী মিছিল করে ছাত্রদল। সেনাবাহিনীর সকল রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৪৪ ধারা ভেঙে ছাত্রদল প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রের পক্ষে স্লোগান দিত।

রাজনীতির সেই টালমাটাল পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালের আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে সেনাসদস্য কর্তৃক শিক্ষার্থী নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। শোষকের রক্তচক্ষু ও তীব্র দমন-পীড়নকে উপেক্ষা করে সাধারণ শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে শামিল হয়। ২১শে আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে পুলিশ বাহিনী নির্মমভাবে হামলা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনা ক্যাম্প সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ২২শে আগস্ট পরিস্থিতি আবারো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাত আটটায় সরকার কারফিউ জারি করে। কারফিউ জারীর পরপরই শিক্ষার্থীদের ওপর চলে নির্মম নির্যাতন। ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মীকে গ্রেফতার হতে হয়; নির্যাতনে তাদের অনেকেই পঙ্গুত্ব বরণ করেন। কিন্তু ছাত্রদল আন্দোলন সংগ্রামের পথ থেকে পিছপা হয়নি। যত কঠিন আঘাতই এসেছে, ছাত্রদল তার চেয়ে বেশি শক্তি নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অবশেষে আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সেনাসমর্থিত মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকার বিদায় নিতে বাধ্য হয়।

তবে মইনুদ্দিন-ফখরুদ্দিন সরকার নিজেরা বিদায় নিলেও আধিপত্যবাদী শক্তির এদেশীয় দোসরদের ক্ষমতার মঞ্চ প্রস্তুত করে দিয়ে যায়। এই অপশক্তি গত পনেরো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের মানুষের সকল মৌলিক অধিকার পদদলিত করে ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করে গিয়েছে। মানুষের ভোটাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর অত্যাচার, নির্যাতনের রেকর্ড অতীতের সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছে। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলো হয়ে উঠেছিল ছাত্রলীগ নামধারী সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য। সর্বোপরি মাফিয়া সরকারের মদদপুষ্ট লুটেরা ও সন্ত্রাসীগোষ্ঠী দেশের

সর্বত্র একটি মগের মুল্লুক প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই ফ্যাসিবাদী সরকারের সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে সবসময়ই সোচ্চার থেকেছে। এর জন্যে ছাত্রদলকে অনেক ত্যাগও স্বীকার করতে হয়েছে। সরকারের লুটপাট, দুর্বৃত্তায়ন, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ইত্যাদির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মী প্রাণ হারিয়েছে। গুম, খুন সহ আওয়ামী মদদপুষ্ট প্রশাসনের নানা নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হয়েছে ছাত্রদলের হাজার হাজার নেতাকর্মী। আধিপত্যবাদী শক্তির আগ্রাসনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেকেই গুম হয়েছে।

সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার অবনতি, আয় বৈষম্য, বিভিন্ন আর্থিক খাতে লুটপাট, দুর্নীতি এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের যথার্থ সুরক্ষা দিতে না পারার প্রতিবাদে ছাত্রদল সবসময় সোচ্চার থেকেছে। তেল, ডিজেল সহ বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম দ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ২০২২ সালের জুলাইয়ে ভোলায় শহীদ হন ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নুরে আলম।

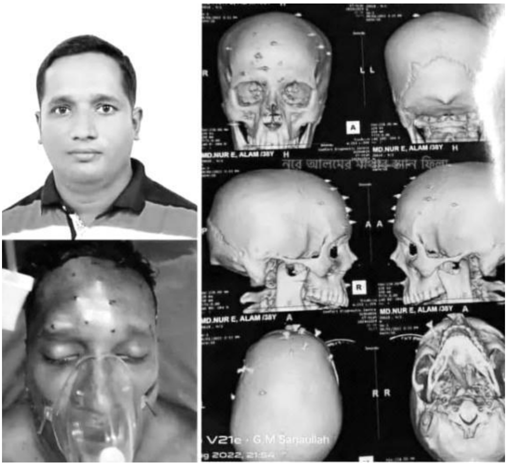

ছবি: তেল-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল করতে গিয়ে আওয়ামী পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ভোলা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নুরে আলম

মানুষের ভাতের অধিকার, ভোটের অধিকার আদায়ের এই ধারাবাহিক সংগ্রামে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য ছাত্রনেতাকে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে ফ্রাংকেনস্টাইনের রূপ ধারণকারী ছাত্রলীগের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের একাধিকবার ছাত্রলীগের হামলার শিকার হতে হয়েছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ ক্যাম্পাস অসংখ্যবার ছাত্রদলের

নেতাকর্মীদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, শিক্ষাঙ্গনে পড়ালেখার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য উৎখাতের এই আন্দোলনে ছাত্রদল সকল বাঁধাবিপত্তি উপেক্ষা করে ধারাবাহিক সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে।

ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্রলীগের অপকর্ম:

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছাত্রদল গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং শিক্ষা ও শিক্ষার্থীবান্ধব কর্মসূচীর মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে রাজনীতি তথা দেশ ও দশের জন্য রাজনীতিতে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করে আসছে। পক্ষান্তরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অপর একটি ছাত্র সংগঠন তথা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষাঙ্গন এবং শিক্ষাঙ্গন ছাড়িয়ে দেশব্যাপী নানা অপকর্ম করে বেড়িয়েছে। আমরা যদি কেবল গত পনেরো বছরের দিকে তাকাই, তাহলেই ছাত্রলীগের খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি সহ নানাবিধ নৈরাজ্যের পাহাড় দেখতে পাবো। ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নোমানি হত্যার মাধ্যমে ছাত্রলীগ তাদের হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এরপর গত ১৫ বছরে ছাত্রলীগের হাতে অপরাপর ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী, সাধারণ ছাত্র, এমনকি নিজ দলীয় কর্মীরাও রেহাই পায়নি। পুরান ঢাকার দর্জি বিশ্বজিৎকে প্রকাশ্যে রাস্তায় কুপিয়ে হত্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ সংগঠনের নেতা জুবায়ের হত্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র আবু বকর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগেরই সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দিয়াজ ইরফান চৌধুরি ও প্রথম বর্ষের ছাত্র তাপস সরকার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মী নাসিরুল্লাহ নাসিম, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাজীব সহ আরো অনেকের রক্তে রঞ্জিত হয় ছাত্রলীগের হাত। এছাড়া ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় বারো বছরের শিশু রাব্বি। ফেসবুকে ভারতবিরোধী পোস্ট করার অভিযোগে বুয়েটের ছাত্রাবাসে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয় আবরার ফাহাদকে।

ছবি: ফেসবুকে ভারতীয় আগ্রাসনবিরোধী পোস্ট করায় ছাত্রলীগের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হওয়া বুয়েটের মেধাবী শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ

ছাত্রলীগের এই হত্যার রাজনীতি শুরু হয় স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার তিন বছর যেতে না যেতেই বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতি রক্তে রঞ্জিত হয়। ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের তৎকালীন শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ইশারায় নিজ সংগঠনেরই সাত কর্মীকে ব্রাশফায়ার করে খুন করা হয়। ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা ঘটে। এর আগে ১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদলীয় কোন্দলের জের ধরে চারজনকে হত্যা করা হয়। ছাত্রদল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এটিএম খালেদ বীর প্রতীককে হত্যা করে ছাত্রলীগ।

কেবল হত্যা, নির্যাতন, শিক্ষাঙ্গনে চাঁদাবাজি ও নৈরাজ্যতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ছাত্রলীগ! বরং বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ তথা ধর্ষণকাণ্ড ঘটাতে থাকে সংগঠনটি। সিলেটের এমসি কলেজে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হন এক নববধূ। একই প্রতিষ্ঠানে এর আগে ছাত্রলীগ নেতা বদরুলের কু-প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয় খাদিজাকে। মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ফিরে আসেন খাদিজা। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামীকে মীর মোশাররফ হোসেন হলে আটকে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটায় ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আন্তর্জাতিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান সহ কয়েকজন। ছাত্রলীগের এসব ধর্ষণকাণ্ড তাদের তৃণমূল নেতাকর্মীদের মাঝেও সংক্রমিত হয়।

অবশ্য ছাত্রলীগের এই ধর্ষণ সংক্রমণ কোনো নতুন ঘটনা নয়। ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের উক্ত শাসনকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জসিমউদ্দিন মানিকের নেতৃত্বে তার অনুসারীরা নারী শিক্ষার্থীদের ধর্ষণ ও যৌন হয়রানি করতে থাকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সময় উক্ত গ্রুপটি 'ধর্ষক গ্রুপ' হিসেবে পরিচিত ছিলো। ১৯৯৮ সালে মানিক তার অনুসারীদেরকে নিয়ে 'ধর্ষণের সেঞ্চুরি' উদযাপন করে। পরবর্তীতে এই মানিককে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। মানিকের ধর্ষক গ্রুপের বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে একপর্যায়ে তারা ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে তারা আবার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। কেবল তাই নয়, মানিকের অন্যতম অনুসারি উক্ত গ্রুপের সদস্য মীর মেহেদি হাসান টিটু ১৯৯৯ সালের ৩

সেপ্টেম্বর ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বাস্থানীয় ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক রেহনুমা আহমেদকে লাঞ্ছিত করে। সেই সময় টিটুকে ক্যাম্পাস থেকে বহিষ্কার করা হলেও পরবর্তীতে ২০১৭ সালে সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে আওয়ামী লীগপন্থী প্যানেল থেকে নির্বাচন করে!

ছাত্রলীগের ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের আরেকটি আলোচিত ঘটনা হচ্ছে, ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনকালে শ্লীলতাহানীর ঘটনা। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল ছাত্রলীগের তৎকালীন সহ সভাপতি ফজলুল হক রাসেল সহ কয়েকজন মিলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে আসা শাওন আক্তার বাঁধনের শ্লীলতাহানি করে। সেই সময়ে আলোচিত ঐ ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেয়ার পর আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় এসে ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রাসেলকে দায়মুক্তি দেয়। কেবল তাই নয়, ২০১১ সালের আগস্টে রাসেল সহ ঘটনার সাথে জড়িত টুটুল ও প্রকাশকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। এতে সুস্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী পর্যায় থেকেই তার ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠন ছাত্রলীগের এসব অপকর্মকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে। এরকমই আরেকটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে ২০১০ সালে ঢাবি ক্যাম্পাসে পহেলা বৈশাখ উদযাপনকালে। এদিন ছাত্রলীগের ছেলেদের হাতে শ্লীলতাহানীর শিকার হন অন্তত ২৫ জন নারী, যার মধ্যে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের শিক্ষার্থী ছিলেন। নিপীড়করা টিএসসি সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের প্রবেশমুখে তিন ছাত্রীর ওড়না ছিনিয়ে নেয় এবং কামিজ ছিঁড়ে ফেলে।

হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজির বাইরে ছাত্রলীগের আরেকটি অপকর্ম হচ্ছে গেস্টরুম কালচারের নামে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হলে ওঠা শিক্ষার্থীদের উপর গেস্টরুমের নামে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে বাধ্য করা সহ বিভিন্ন অনিয়ম ও অনৈতিকতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার বিস্তর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। কোনো শিক্ষার্থী যদি ছাত্রলীগের নিয়মমতো গেস্টরুমে উপস্থিত না হতো এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন প্রোগ্রামে না যেত, তখনই তাদের উপর নির্যাতনের খড়গ নেমে আসতো। এরকম গেস্টরুম নির্যাতনের শিকার হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী হাফিজুর মোল্লা মৃত্যুবরণ করেন; চোখ হারিয়েছেন এহসান রফিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলের এই অপসংস্কৃতির শিকড় ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। এরকমই একটি ঘটনা ঘটে

কুষ্টিয়ার বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ হাসিনা হলে এক নবীন শিক্ষার্থীকে রাতভর নির্যাতন ও বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি সানজিদা চৌধুরী অন্তরা ও তার সহযোগীরা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন সমস্যা, আবাসন সংকট, ছাত্রলীগের নৈরাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে ছাত্রলীগের হামলা, নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে ঢাবি ছাত্রলীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের হাতে ছাত্রীদের লাঞ্ছিত হবার ঘটনা ঘটে।

ছাত্রলীগ তাদের দৌরাত্ম্য এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বহিঃপ্রকাশ কেবল প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি। বরং বিভিন্ন সময়ে তারা বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপরও হামলা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত গণতান্ত্রিক রাজনীতি চর্চার সূতিকাগারও তাদের এই ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। বিরোধী মত পোষণ করা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা পোষণ করায় বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথিতযশা একাধিক শিক্ষকের উপর ছাত্রলীগ বিভিন্ন সময়ে চড়াও হয়েছে। কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, বরং অন্যান্য কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ছাত্রলীগের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাঁধা দেওয়ায় শিক্ষকদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, ক্যান্টিনে ফ্রি খাওয়া, হল দখল, সিট বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের মতো বিষয়গুলো ছাত্রলীগের নামের সাথে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বড় অংকের চাঁদা দাবী করার সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ছাত্রলীগের শীর্ষ দুই নেতাকে বহিষ্কারের মতো ঘটনা পর্যন্ত ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর সংলগ্ন বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রীতিমতো আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদা তুলতো। এমনকি চাঁদার টাকা না দেয়ার অভিযোগে অনেককে অপহরণ করার মতো ঘটনাও ঘটে। ২০২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে দুই ব্যবসায়ীকে আটকে রেখে নির্যাতন করে ছাত্রলীগের টাকা আদায়ের খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এসব চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে অনেক সময় ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপ, উপগ্রুপসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এর ফলে সার্বিকভাবে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ালেখার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে।

ছাত্রলীগ নেতাদের ফ্রি খাওয়ার ফলে হল ক্যান্টিনগুলোতে খাবারের মান ঠিক রাখতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। বাকি টাকা চাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলে ক্যান্টিন মালিকের দাঁড়ি ছিঁড়ে ফেলার মতো বর্বর কাজ করতেও বাকি রাখেনি সংগঠনটি। ফ্রি খেতে না দেওয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যান্টিনকর্মীকে মারধর করা হয়। এরকম ঘটনা অহরহই ঘটেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। হাজার হাজার বাকি টাকা উদ্ধার করতে না পেরে ক্যাম্পাসগুলোতে অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সীট দখল, কমিটি গঠন ইত্যাদি কেন্দ্র করে অসংখ্যবার নিজেদের মধ্যে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে কমিটি গঠন নিয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মারামারি ক্যাম্পাসে আতংক সৃষ্টি করে। এছাড়াও ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ইডেন কলেজে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেত্রীদের মারামারির ঘটনা দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এসব নিয়ে প্রতিবেদন করার কারণে বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকদেরকেও হামলা, নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে।

আওয়ামীলীগ সরকারের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পরিণত হওয়া ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ধর্ষণ, হত্যা, রাহাজানি শেখ মুজিব শাসনামলের রক্ষীবাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কোটা সংস্কার আন্দোলন ও নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের মত জনস্বার্থমূলক যৌক্তিক আন্দোলনে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া ছাত্রনেতাদেরকে জেলে ঢোকানো হয়েছে; শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। এভাবে যখনই গণতন্ত্র ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের পক্ষে বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসমাজ তথা আপামর সাধারণ মানুষ মাঠে নেমেছে তখনই আওয়ামী লীগের লাঠিয়াল সংগঠন ছাত্রলীগ তাদের ওপর চড়াও হয়েছে। সকল ন্যায় নীতিকে উপেক্ষা করে, ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে কলুষিত করে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিতে নেতিবাচক কালিমা লেপন করে ছাত্রলীগ।

অন্ধকারের অবসানঃ

অবশেষে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে এদেশের ছাত্র জনতা অভূতপূর্ব অভ্যুত্থান ঘটায়। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ এর ব্যানারে গড়ে উঠে গণ জাগরণ। চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা প্রথার অবসান ঘটিয়ে যৌক্তিক সংস্কারের দাবীতে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্দোলনের সূচনা ঘটে। কিন্তু অতীতের মতোই জনগণের অধিকারকে পদদলিত করে ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা আওয়ামী লীগ আবারও

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর চড়াও হয়। একের পর এক লাশ পড়তে শুরু করে। এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের চাকুরিতে বৈষম্যের প্রতিবাদে গড়ে উঠা আন্দোলন রূপ নেয় রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বিরাজমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে উঠা গণ অভ্যুত্থানে। দেশের আপামর জনতা নিজেদের নাগরিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবীতে অবতীর্ণ হয় এক মরণপণ যুদ্ধে। টানা ৩৬ দিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পতন ঘটে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের। জনগণের তীব্র আন্দোলনের মুখে পালিয়ে যায় খুনি হাসিনা ও তার দোসরেরা।

ছবি: ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানে বিজয়ের প্রতীকী ছবি

জুলাই অভ্যুত্থান, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ, ফ্যাসিবাদের পতন ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলঃ

৫ আগস্ট, ২০২৪। বাংলাদেশের ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর একরাশ অনিশ্চয়তা সাথে নিয়ে দিনের আলো ফুটতে শুরু করে। দেশ জুড়ে আওয়ামী সন্ত্রাসী ও আজ্ঞাবহ পুলিশ বাহিনীর দৌরাত্ম্য। সূর্যের আলো দ্যুতি ছড়াতে শুরু করলো। আর সেই আলো থেকেই ছড়াতে লাগলো মুক্তির বার্তা; নতুন দিনের প্রত্যাশা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মুক্তির আয়োজন জোরদার হতে শুরু করলো। অতঃপর দিনের মাঝামাঝি সময়ে দীর্ঘ পনেরো বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের উপর চেপে থাকা জগদ্দল পাথর সরে গেলো। বাংলাদেশের আকাশ থেকে দূরীভূত হলো পৃথিবীর ইতিহাসের ভয়ংকরতম স্বৈরাচারের অন্ধকার ছায়া। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে রাখা খুনি হাসিনার পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাসে যুক্ত হলো এক নতুন অধ্যায়। তবে এই ভয়ংকর সময়ের অবসান একদিনে হয়নি। এর জন্য রক্ত দিতে হয়েছে অসংখ্য দেশপ্রেমিক ছাত্রজনতাকে; প্রাণ ঝরেছে অগনিত মেধাবী তরুণের।

আওয়ামীলীগের নীতি ও বৈষম্যঃ

‘রেড মুনসুন’ বা ‘জুলাই আপরাইজিং’ হিসেবে স্বীকৃত এই আন্দোলনের সূচনা হয় বাংলাদেশের সংবিধানকে ব্যবহার করে ফ্যাসিস্ট হাসিনা এবং আওয়ামী শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ হাসিল এবং দুঃশাসনের ফলে জনগণের মাঝে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে। বাংলাদেশে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ‘কোটা প্রথা’ নামক বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে অসংখ্য মেধাবী তরুণের ভবিষ্যত এক প্রকার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলো। চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা সন্তান ও তাদের নাতি-নাতনিদের জন্য ৩০% সহ মোট ৫৬% কোটা রেখে সাধারণ চাকুরিপ্রার্থীদের জন্য মাত্র ৪৪% আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় এসেছে তখনই তারা মুষ্টিমেয় নাগরিককে সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করে ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করার চেষ্টা করেছে। পক্ষান্তরে দেশের বিশাল সংখ্যক নাগরিককে সুবিধাবঞ্চিত রেখে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটি বৈষম্য বজায় রেখেছে। এর ফলে রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে একটি সুস্পষ্ট বিভাজন তারা তৈরি করে রেখেছিল। এর সাথে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ শাসনের ধিক্কৃত নীতি তথা ‘ডিভাইড এন্ড রুল’ এর মিল পাওয়া যায়।

আওয়ামীলীগের শাসন প্রক্রিয়ার এই নীতির সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র এবং সংবিধানের স্পষ্ট দ্বন্দ্ব দেখা যায়। আমাদের মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে স্পষ্টভাবে ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার’ এর কথা বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মৌল চেতনা হিসেবে স্বীকৃত ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার’ শব্দবন্ধের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার অবৈধ ক্ষমতার মেয়াদ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনাকে উপেক্ষা করে গিয়েছে। তারা তাদের ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করে গিয়েছে। যখন যেখানে যেভাবে চেতনা বিক্রি করে সুবিধা ভোগ করা যায়, তারা ঠিক সেভাবেই এগিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের নাগরিক চেতনাকে উপেক্ষা করে তারা মুজিববাদী দলীয় চেতনার ফেরি করে বেড়িয়েছে। উপরন্তু তারা অসংখ্য আওয়ামী লীগের নেতাদের ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ দিয়ে চাকুরিক্ষেত্রে দলীয়করণের পথ সুগম করেছে।

কেবল তা-ই নয়; চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের এই নীতি বাংলাদেশের সংবিধানেরও পরিপন্থী। প্রচলিত ‘কোটা প্রথা’ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯, ২৮ এবং ২৯ নং অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক। সংবিধানের ১৯ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। মানুষে মানুষে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর নিশ্চিতে সুষম সুযোগ প্রদান নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারীপুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়াও সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বা পদ লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

আওয়ামী সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা ও দমন-পীড়নঃ

চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে হাসিনা সরকার প্রণীত এবং গৃহীত নীতি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মাঝে একটি অসম বন্টনের মাধ্যমে সংবিধান লঙ্ঘন করে আসছিলো। এদেশের মেধাবী তরুণেরা বারবারই সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে। বিদ্যমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসানের জন্য ২০১৩ সাল প্রথম আন্দোলনের সূচনা হয়। ফলশ্রুতিতে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের লাঠিয়াল বাহিনী তথা ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলে পড়ে। তবে তরুণদের স্ফুলিঙ্গকে চেপে রাখা যায়নি। ২০১৮ সালে পূনর্বার চাকুরিপ্রার্থীরা আন্দোলন শুরু করে। পুলিশ এবং ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দিয়ে আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছিলো সেবার। একইসাথে ছলচাতুরির মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। সাধারণ চাকুরিপ্রার্থীরা কোটা প্রথার সংস্কার চাইলেও সরকার নির্বাহী আদেশে পুরো কোটা প্রথাকে বাতিলই করে দেয়। এর পেছনে মূলতঃ আওয়ামী লীগের হীন দুরভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল। সংস্কার না করে বাতিলের সিদ্ধান্ত দিয়ে মূলতঃ তারা পরবর্তীতে আদালতকে ব্যবহার করে পুরনো কোটা প্রথা ফিরিয়ে আনার নীলনকশা প্রস্তুত করে রেখেছিল। এবং তারা সেই কাজটিই করে ২০২৪ সালে এসে। ‘আমি ও ডামি’ মার্কা একটি প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করার পর হাসিনা সরকার আদালতকে ব্যবহার করে বৈষম্যমূলক কোটা প্রথাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে। তবে অবৈধ আওয়ামী সরকারের এই ফ্যাসিবাদী নীতি ছাত্র-জনতা মেনে নেয়নি।

মূলত ‘কোটা প্রথা’ সংস্কারের দাবী থেকে এই আন্দোলন শুরু হলেও, এর নির্যাস লুকিয়ে ছিল বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মধ্যে। অবৈধ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ পনেরো বছরেরও বেশি সময়কালের শাসন-শোষণে অতিষ্ট সাধারণ মানুষ নিজেদের জান ও মালের সুরক্ষা এবং সম্মান ও নিরাপত্তার দাবীতে রাস্তায় নেমে আসে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিন্দুমাত্র সম্মান না পাওয়া, ভোটাধিকার, যাবতীয় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকা আপামর জনতার এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ইতিহাসের এক মহান অধ্যায় রচনার পথে এগিয়ে চললো।

তবে সরকার তার পুরনো পথেই চলা শুরু করলো। আন্দোলন দমনে পুলিশ লেলিয়ে দিলো। লাঠিয়াল ছাত্রলীগকে নামিয়ে দিলো। ১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটলো ন্যাক্কারজনক ঘটনা। সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের পাশাপাশি পেটোয়া পুলিশ বাহিনীর হামলায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী মারাত্মকভাবে আহত হয়। অন্যদিকে অবৈধ সরকারের প্রধান খুনি হাসিনা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদেরকে ‘রাজাকারের সন্তান’ বলে গালিগালাজ করে। আওয়ামী লীগের অপরাপর নেতাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা এবং নিপীড়নমূলক নীতির ফলে দেশজুড়ে এক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে শহীদ হয় আবু সাঈদ, ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম আকরাম সহ আরও অনেকে।

বীর চট্টলার
প্রথম শহীদ
শহীদ
ওয়াসিম

ছবি: জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ আবু সাইদ ও শহীদ ওয়াসিম আকরাম

সরকারের পুরনো খেলার অংশ হিসেবে এই আন্দোলনকে ‘বিএনপির আন্দোলন’ হিসেবে আখ্যায়িত করে দলটির অসংখ্য নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হলো; বন্ধ করে দেয়া হয় দলীয় কার্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়, দেশজুড়ে কারফিউ জারি করা হয়, সেনা মোতায়েন করা হয়,

শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ। ব্লক রেইডের নামে বাসায় ঢুকে ঢুকে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের সহ আন্দোলন সংশ্লিষ্ট ছাত্রজনতাকে গ্রেফতার অভিযান শুরু হয়।

ছবি: শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবির সমর্থনে নয়াপল্টনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মিছিল;
২৪ জুন ও ১৬ জুলাই ২০২৪ খ্রি.

অভ্যুত্থানে ছাত্রদলের ভূমিকা এবং ঝরে পড়া শত প্রাণ:

এই আন্দোলনের শুরু থেকেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল শিক্ষার্থীদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার ছিল। অসাংবিধানিক 'কোটা প্রথা' এর যৌক্তিক সংস্কারের দাবীতে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির ১২ই জুলাই, ২০২৪ তারিখে নয়া পল্টনে দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরে। ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বলা হয়, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য অতি সীমিতসংখ্যক কোটা ছাড়া বাংলাদেশে এই মূহুর্তে আর কোনো কোটার প্রয়োজন নেই। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে বলা হয়, সাধারণ শিক্ষার্থীরা কোটা সংস্কারের দাবীতে যে আন্দোলন করছেন সেটির বিষয়ে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। এর আগে ২৫শে জুন ২০২৪ তারিখে কোটা সংস্কারের যৌক্তিক দাবীতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবীর সাথে একাত্মতা পোষণ করে ছাত্রদল নয়া পল্টনে মিছিল ও সমাবেশ করে। ১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নয়া পল্টনে মিছিল ও সমাবেশ করার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সহ কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে।

এর পরপরই ছাত্রদল নেতাকর্মীদের উপর দমন-পীড়নের খড়গ নেমে আসে। পুলিশ বাসায় বাসায় গিয়ে নেতাকর্মীদেরকে গ্রেফতার করা শুরু করে। তবে বিগত সতেরো

বছর ধরে রাজপথের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া সংগঠন ছাত্রদল ভয় পায়নি। বরং নতুন উদ্যমে ছাত্রদলের অকুতোভয় সৈনিকেরা রাজপথের আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেয়। টানা ৩৬ দিনের আন্দোলনে ছাত্রদল সকল বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগসহ যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের সন্ত্রাসী বাহিনী এবং কতিপয় বিপথগামী পুলিশ নামক সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রাজপথে সরব অবস্থান ধরে রাখে। আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী শহরকে আটটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করে আন্দোলন পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্যদের নেতৃত্বে নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে আন্দোলন পরিচালনা করা হয়।

বিনিময়ে ছাত্রদলকে অনেক ত্যাগও স্বীকার করতে হয়েছে। ছাত্রদলের শতাধিক নেতাকর্মী দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করার এই আন্দোলনে শহীদ হয়। জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় শহীদ চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের সদস্য ওয়াসিম আকরাম তার মাকে কথা দিয়েছিলেন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চাকুরিতে যোগ দেবে। তার পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে অতঃপর। কিন্তু শহীদ ওয়াসিম আকরাম তার মাকে দেয়া কথা রাখতে পারেনি। চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে শহীদ হয়েছে। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বাকিদের জন্য এঁকে দিয়ে গিয়েছে একটি স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ।

শহীদ ওয়াসিম আকরামের মতোই নিজেদের রক্ত দিয়ে স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশ উপহার দিয়ে গিয়েছে মাগুরা জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মেহেদি হাসান রাব্বি, ঢাকা মহানগর পূর্ব ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আরিফুর রহমান রাসেল, মুন্সীগঞ্জের মীরকাদিম উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মানিক মিয়া শারিক, শেরপুরের মাহবুব আলম, সবুজ মিয়া, লক্ষীপুর সরকারি কলেজের কাউসার হোসেন বিজয়, ভোলার ফজলে রাব্বি, ঢাকা মহানগর ছাত্রদলের ইসমাইল হোসেন রাব্বি, শাওন, শামিম হাওলাদার, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইরফান ভুঁইয়া, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির ইমতিয়াজ আহমেদ জাবীরসহ ছাত্রদলের শতাধিক নেতাকর্মী। মৃত্যুর এই মিছিল এখনো চলমান। এখনো চিকিৎসাধীন অবস্থায় শহীদ হচ্ছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

ছবি: ছাত্র-জনতার জুলাই অভ্যুত্থানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের শতাধিক শহীদ নেতাকর্মীদের কয়েকজন

তারেক রহমানের নীতি ও নির্দেশনাঃ

জুলাই অভ্যুত্থানের সূচনা কোটা সংস্কারের দাবী থেকে শুরু হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি স্বৈরাচার হটানোর এক দফা দাবী আদায়ের আন্দোলনে রূপ নেয়। ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ এর ব্যানারে সূচিত এই আন্দোলন ক্রমশই রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে বিদ্যমান বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে পরিণত হতে থাকে। চাকুরিপ্রার্থী শিক্ষার্থীদের পরিমণ্ডল থেকে বের হয়ে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে আন্দোলনে এসে শামিল হয়, শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক দল, দেশের সুশীল সমাজ, শিল্পী সমাজ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ব্যক্তিবর্গ সহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ। দেশের আপামর জনতার রক্তে লাল হয় বাংলাদেশের মানচিত্র। রাজপথ থেকে শুরু করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবাদের অগ্নিশিখা। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরাও নিজেদের অবস্থান থেকে এই আন্দোলনে শামিল হয়। এমনকি ভারত সহ বিভিন্ন দেশেও বাংলাদেশের এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানিয়ে মিছিল, সমাবেশ হতে থাকে।

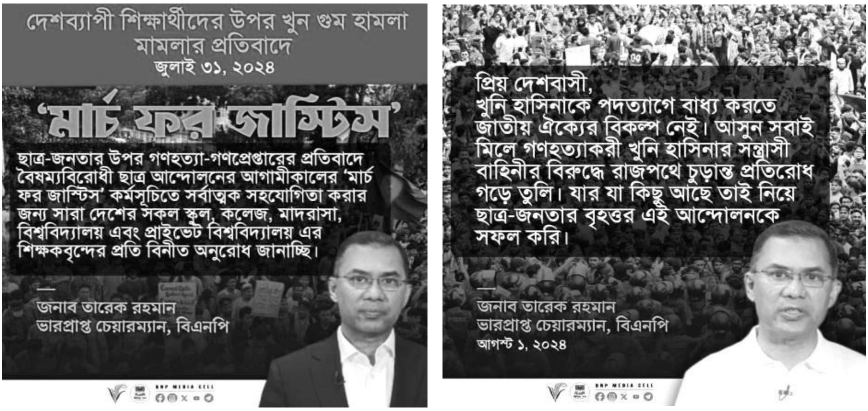

দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের উপর খুন গুম হামলা
মামলার প্রতিবাদে
জুলাই ৩১, ২০২৪

‘মার্চ ফর জাস্টিস’

ছাত্র-জনতার উপর গণহত্যা-গণপ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আগামীকালের ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য সারা দেশের সকল স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষকবৃন্দের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

—
জনাব তারেক রহমান
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বিএনপি

প্রিয় দেশবাসী,
খুনি হাসিনাকে পদত্যাগে বাধ্য করতে জাতীয় ঐক্যের বিকল্প নেই। আসুন সবাই মিলে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনার সন্ত্রাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে রাজপথে চুড়ান্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলি। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ছাত্র-জনতার বৃহত্তর এই আন্দোলনকে সফল করি।

—
জনাব তারেক রহমান
ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বিএনপি
আগস্ট ১, ২০২৪

ছবি: জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সমর্থনে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তারেক রহমান-এর আহ্বানের অংশবিশেষ

অধিকার আদায়ের এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে খুনি হাসিনার পতনকে ত্বরান্বিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান। আন্দোলনকে দলীয় আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গণমানুষের আন্দোলনে রূপান্তর করার এই কঠিন কাজটি করেছেন তিনি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনকে খুনি হাসিনার পতনের এক দফা দাবী আদায়ের আন্দোলনে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে তারেক রহমানের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি ধাপে ধাপে এই আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রদলের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে কাজ করেছেন। ছাত্রদলকে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের অবস্থান থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া, শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে আন্দোলনে সহযোগিতা করা সহ বিভিন্ন কর্মপন্থা নির্ধারণে দিকনির্দেশনা দিয়ে তিনি পাশে থেকেছেন। এক্ষেত্রে বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জনাব রকিবুল ইসলাম বকুল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই আন্দোলনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। দীর্ঘদিন যাবত এই মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার করা আওয়ামীলীগের সকল কৌশলকেই তারেক রহমান তাঁর সুগঠিত চিন্তার মাধ্যমে মোকাবিলা করেছেন। আওয়ামীলীগের শহীদদের স্মরণে শোক প্রকাশের জন্য ফেসবুকের প্রোফাইল পিকচার কালো করার প্রহসনকে তিনি বিপ্লবের প্রতীক ‘রক্তবর্ণ লাল’ রঙে রঙিন করার প্রস্তাবনা দেন। এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের দীর্ঘকালের মেকি আধিপত্যে ধস নামে। এছাড়াও ছাত্রদল সহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের মেধাবী নেতাকর্মীদের মাধ্যমে আন্দোলনের পক্ষে বিভিন্ন বয়ান তুলে ধরে আওয়ামীলীগকে রাজনৈতিকভাব মোকাবিলা করার পথ বাতলে দেন জনাব তারেক রহমান।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও বিএনপির রাষ্ট্রভাবনাঃ

বৈষম্যবিরোধী গণ আন্দোলনের মূল চেতনা হচ্ছে, দীর্ঘকালের ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে একটি সমতাভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক চেতনাকে বিকৃত করে আওয়ামী লীগ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ব্যবসা শুরু করেছিল তার অবসান ঘটানো ছিল এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের দীর্ঘ পনেরো বছরে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে অসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, শোষণ-নিপীড়নের সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে, গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, ভোটাধিকার হরণের মাধ্যমে নাগরিকদের ন্যূনতম সম্মানটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়েছে, একটি মাফিয়াতান্ত্রিক ও পারিবারিক রাষ্ট্রপ্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসব অন্যায়, অনাচারের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক বন্দোবস্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল দীর্ঘদিন যাবত এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালে ভিশন- ২০৩০ ঘোষণা এবং ২০২২ সালে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা প্রস্তাবনা প্রদানের মাধ্যমে বিএনপি ভবিষ্যত বাংলাদেশের রূপরেখা প্রকাশ করেছে।

বিএনপি একটি বহুত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা, একটি ঐক্যবদ্ধ বহুমাত্রিক জাতিসত্তা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয়। এ লক্ষ্যে বিগত ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় ঘুণে ধরা প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং সাংবিধানিক কাঠামোতে সংস্কার প্রয়োজন। বিএনপি তার ঘোষিত ৩১ দফায় এ লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মকৌশলের বর্ণনা দিয়েছে। সর্বোপরি বিএনপি আগামীর বাংলাদেশকে একটি মানবিক ও কল্যাণমুখী বাংলাদেশ হিসেবে দেখতে চায়। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান কাঠামোতে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাতে হবে। আর এ লক্ষ্যে কাজ করবে এদেশের তরুণ সমাজ। বিএনপির সহযোগী সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল রাষ্ট্রগঠনের এ প্রক্রিয়াকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনে করে, তরুণ প্রজন্মের মাধ্যমেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তথা সকল ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য ও সমসাময়িক প্রেক্ষাপট:

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের পরতে পরতে এদেশের ছাত্রসমাজের ভূমিকা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯৪৮ সালে দেশভাগ পরবর্তী পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর শোসকগোষ্ঠীর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে এদেশের ছাত্রসমাজ বরাবরই সোচ্চার ছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের পরিক্রমায় মহান মুক্তিযুদ্ধ- বাংলাদেশের একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার এই ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রয়েছে। বলা চলে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনা থেকে সফলতা পর্যন্ত পুরোটাই ছাত্রদের অবদান। এদেশের ছাত্রসমাজের জাগরণের মধ্য দিয়েই সমগ্র জাতি মুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

একটি রাষ্ট্রগঠনে বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকাই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল অতীতের মতোই বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ তাদের অধিকার আদায়ে সবসময় পাশে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি উল্টো পথে হাঁটা শুরু করে। তৎকালীন শাসকদল আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ লুটেরা, মজুতদার এবং মুনাফাখোরদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লুটতরাজে অংশগ্রহণ করে। মুজিববাদী ছাত্রলীগের অনেক নেতারই অল্প সময়ের ব্যবধানে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। কেবল তাই নয়, যে গণতন্ত্রের জন্য এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, সে গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরার আওয়ামী প্রচেষ্টায় ছাত্রলীগ অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে। মুজিববাদী ছাত্রলীগের এ দুর্বৃত্তায়ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করে। এরই ফলাফলস্বরূপ ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে মুজিববাদী ছাত্রলীগের ভরাডুবি হয়। ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় ডাকসু নির্বাচনেও মুজিববাদী ছাত্রলীগ তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, কেন্দ্র দখল, জাল ভোটের প্রচলনের শুরু হয় মুজিববাদী ছাত্রলীগের মাধ্যমেই। সময়ের সাথে সাথে এদের দুর্বৃত্তপনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে ক্রমেই মুজিববাদী ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে একটি ঘৃণিত সংগঠনে পরিণত হয়। সুতরাং অনুমিতভাবেই পরবর্তী ডাকসু নির্বাচনে তাদের পুনর্বার ভরাডুবি ঘটে। এই

পর্যায়ে শেখ মুজিব তার পতন ঠেকাতে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতাকে সুসংহত করে। ছাত্রলীগ ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক অধ্যায় তথা বাকশাল সরকারের সুরক্ষায় বিরোধী মত নিধনে লাঠিয়ালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ছাত্র রাজনীতির সেই চ্যালেঞ্জিং সময়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আবির্ভাব ঘটে। ছাত্রলীগের হাত ধরে কলুষিত ছাত্র রাজনীতিকে শিক্ষার্থী ও জনবান্ধব করার ক্ষেত্রে ছাত্রদল অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে। স্বৈরাচার এরশাদের শাসনামলে এরশাদ সরকারের মদদপুষ্ট জাতীয় ছাত্রসমাজের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং নব্বই পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগের নৈরাজ্য, রাহাজানীর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ছাত্রদল সবসময় গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং শিক্ষার্থী সুরক্ষার রাজনীতি করে আসছে। যদিও ছাত্রদলের এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা বরাবরই তাদেরকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। কিন্তু ছাত্রদল সব বাঁধা অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

বিগত পনেরো বছর ধরে অবৈধভাবে টানা ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে আওয়ামী লীগ। ২০২৪ সালে তারা টানা চতুর্থবারের মতো অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু তাদের এই টানা মেয়াদে জনগণের মতামতের কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। বিনা ভোটে, দিনের ভোট রাতে সম্পাদন করে এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে পদ্ধতিগতভাবে নির্বাচনের বাইরে রেখে আওয়ামীলীগ তার এই টানা মেয়াদ উপভোগ করে। জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি এবং জনমতের প্রতিফলন না থাকার ফলে আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেনি। আওয়ামী লীগের এই ঔদ্ধত্য তার অন্যান্য সহযোগী সংগঠনসমূহের মতো ছাত্রলীগের মাঝেও সংক্রমিত হয়। জবরদস্তিমূলক ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করে ছাত্রলীগ বেপরোয়া মূর্তি ধারণ করে। রাষ্ট্রের মূল জায়গায় গণতান্ত্রিক চেতনার অনুপস্থিতি সমস্যাকে ঘনীভূত করে তোলে। দলের হাইকমান্ডের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ছাত্রলীগ সমগ্র দেশ জুড়ে সীমা লঙ্ঘনের সুযোগ পায়। ছাত্রলীগের এই দুর্বৃত্তপনার প্রভাব পড়ে সামগ্রিক ছাত্র রাজনীতিতে। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়ন করে ছাত্রলীগ এক ধরণের মগের মুল্লুক কায়েম করে। বহুত্ববাদী রাজনীতির চর্চাকে রুদ্ধ করার ফলে তাদের অপকর্মকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোনো সুযোগও ছিল না। ক্ষেত্রবিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনগুলোও তাদের এসব অপকর্মে সহায়তা করতে থাকে। এর ফলে সামগ্রিক ছাত্র রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং অনুমিতভাবেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র রাজনীতির প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়।

এদেশের উৎপাদনক্ষম জনগোষ্ঠী তাদের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার ফলে নিজেদেরকে রাষ্ট্রীয় উপাদানসমূহে অপাংক্তেয় মনে করতে থাকে। ফলে জাতীয় উৎপাদন ও সৃজনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষিত তরুণদের অনেকেই নিজেদের মতামতের মূল্য না পেয়ে হতাশ হয়ে বিদেশ পাড়ি জমাতে শুরু করে। এটি একটি রাষ্ট্রের জন্য নিকট ভবিষ্যতে বড় ধরণের মেধাবিপর্যয় তৈরি করতে পারে।

অথচ ছাত্র রাজনীতি বলতে কী বোঝায় ?

ছাত্র রাজনীতির মানে হচ্ছে, নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারা এবং কর্তব্য পালনে দায়িত্বশীল থাকা; সাধারণ ছাত্রদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সরব ও সচেষ্ট থাকা; বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার প্রসারে কাজ করা; সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে সচেতন মতামত প্রকাশ করা; এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মুক্তচিন্তা ও বাক স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করা। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে ছাত্রলীগের রাজনীতিতে এই বিষয়গুলোকে পদদলিত করা হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির অতীত ঐতিহ্যকে ধারণ করে এর মৌলিক উদ্দেশ্যকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষিত তরুণদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতার সঞ্চার করতে হবে। দেশাত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মেরামতের প্রকল্পে এদেশের তরুণ সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে আর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সময়ের এই প্রাসঙ্গিকতাকে ধারণ করে। ছাত্রলীগের এহেন অপরাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে এদেশের ছাত্রসমাজ তথা সমগ্র জাতিকে উদ্ধারকাজে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখার প্রতিজ্ঞা করে। ছাত্রদল মনে করে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই কেবল শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির পুনর্জাগরণ সম্ভব।

পরিবর্তিত রাজনীতির চ্যালেঞ্জ:

সময়ের সাথে সাথে রাজনীতির নানা বাঁক বদল হচ্ছে। বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশেও। আধুনিক বিশ্বে রাজনীতি এখন কেবলই ক্ষমতায় যাওয়ার লড়াই নয়; বরং রাজনীতিতে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব ক্রমশই বাড়ছে। বিশ্বায়নের যুগে এই বাস্তবতাকে ধারণ করেই রাজনৈতিক কর্মপন্থা ধারণ করতে হবে। বিশেষ করে, আধুনিকতার এই যাত্রায় তথ্য প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ মানবজীবনের সাথে জড়িত প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করছে।

বর্তমান সময়টাকে বলা হচ্ছে, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কাল। এই সময়ে প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক পাঠশালা গড়ে উঠছে। মিডিয়া হাউজগুলো ক্রমশই অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নির্ভর হয়ে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রেই মূলধারার সংবাদ মাধ্যম, এমনকি বিনোদন মাধ্যমগুলোও ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, ইউটিউব সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। বিনোদন জগতে নতুন ধারা যোগ করেছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো।

সর্বোপরি আমরা একটি প্রযুক্তি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, বায়ো টেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর বহুমাত্রিক আবিষ্কার ও বহুল ব্যবহারের ফলে ক্রমশই বিশ্বব্যবস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে। কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের মিশ্র প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। করোনা মহামারির সময়ে এসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন দারুণভাবে টের পাওয়া গিয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের এ ধারা কেবল শিল্পপ্রযুক্তি খাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি বিষয়েও বিজ্ঞানের ছোঁয়া লেগেছে।

এসব ইতিবাচকতার বিপরীতে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের কিছু নেতিবাচক বিষয়ও যুক্ত হচ্ছে। বিশেষ করে ডিপ ফেইক প্রযুক্তির মতো বিভিন্ন প্রোপাগাণ্ডামূলক প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হচ্ছে। আশঙ্কাজনকভাবে এসব প্রযুক্তি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির রাজনৈতিক মূল্য বহুবিধ। বিশেষ করে, বর্তমান বিশ্ব যখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জামানায় প্রবেশ করেছে, তখন তরুণ সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুলাংশে বেড়ে গিয়েছে। আমরা এই সময়টাকে বলছি, ‘এইজ অব আইডিয়া’। একটি ধারণা এবং তার সফল প্রয়োগ পুরো বিশ্বব্যবস্থা তথা অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি রাজনীতিকে প্রতিনিয়ত পাল্টে দিচ্ছে। সময়ের এই গতিময় অনিবার্যতাকে ধারণ করেই রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদেরকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা বাংলাদেশ কোনোভাবেই এর ব্যতিক্রম নয়। বরং বাংলাদেশের সামনে এই চ্যালেঞ্জের ব্যাপকতা অনেক। যেহেতু বাংলাদেশ একটি স্বল্প শিল্পোন্নত দেশ, সেহেতু এদেশের রাজনীতিবিদদের

এসব বিষয়ে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিজেদের সুরক্ষা এবং বিশ্ব দরবারে মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানের জন্যই রাজনীতিবিদদেরকে, বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী হতে হবে।

ছাত্রদলের প্রতিশ্রুতি:

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় দর্শন 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ', বহুদলীয় গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার ভিত্তিক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল প্রতিষ্ঠা করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ যে শোষণবিহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সাম্যভিত্তিক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। স্বৈরশাসন ও দুঃশাসনের যাঁতাকলে তাদের স্বপ্নগুলো পিষ্ট হয়েছে। 'শিক্ষা, ঐক্য, প্রগতি' স্লোগানকে ধারণ করে ছাত্রদল প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে একটি আলোকিত ছাত্রসমাজকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে লড়াই-সংগ্রাম করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সকল ধর্মবিশ্বাসের মানুষ, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীসমূহ সহ সকল জাতি-গোষ্ঠী ও মানুষের চিন্তা চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি অংশীদারিত্বমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারসম্পন্ন, জনকল্যাণমূলক, সহিষ্ণু, মানবিক, শান্তিকামী ও সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)- এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ছাত্রদল দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে।

ছাত্রদল মনে করে, বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে যে উৎপাদনশীল ও কল্যাণমুখী শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল, সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। আধিপত্যবাদী শক্তির দোসররা এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেশকে একটি মেধাহীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে ষড়যন্ত্র চালিয়ে গিয়েছে। বারবার বাংলাদেশের জনবিরোধী শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন করে তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের শিক্ষা কারিকুলামে বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতির বদলে ভারতীয় সংস্কৃতির আমদানি করা হয়। ইতিহাস বিকৃতি, ধর্মবিদ্বেষী উপাদান সংযুক্ত করে পাঠ্যসূচীতে একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে প্রণোদনা দেয়া হয়। এর ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিজ দেশের প্রকৃত ইতিহাস, সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহ সম্পর্কে কোনো ধারণা পায়নি। ছাত্রদল দেশবিরোধী

ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে পাঠ্যক্রম ও শিক্ষানীতিতে দেশবিরোধী আধিপত্যবাদী শক্তির এই হীন অপচেষ্টা রুখে দিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাত্রদল শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের প্রকৃত মালিকানা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

একটি দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যখন নেতিবাচকতা ভর করে, তখন তা সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে না পারা ভিনদেশি চক্রটি তাদের এদেশীয় দোসরদের সাথে নিয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রথমেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে নিয়েছে। উভয় খাতে ভিনদেশি আগ্রাসনের প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ঘটেছে। সমাজে অস্থিরতা ও নৈরাজ্য ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল একাডেমিক কারিকুলাম, সঠিক ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চা এবং ইতিবাচক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে একটি মানবিক, সহিষ্ণু, ন্যায়ানুগ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক সমাজ সৃষ্টির সঠিক ও যথাযথ প্রচেষ্টা ছাত্রদল তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই করে যাচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ। অর্থাৎ এই মূহুর্তে একটি বিশাল জনমিতিক ক্রান্তি ধারণ করছে। কিন্তু কর্মমুখী শিক্ষা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে এই বিশাল কর্মক্ষম মানুষকে উপযুক্ত কাজে বিনিয়োগ করা যাচ্ছে না। কর্মক্ষম মানুষের অনুপাত ভারী হলে দ্রুত ও উচ্চহারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব। জনমিতিক ক্রান্তি থেকে উদ্ভুত সুবিধা গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই দক্ষিণ কোরিয়া আজ বিশ্বের

ছবি: কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সাথে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)

অন্যতম একটি উন্নত রাষ্ট্র। অন্যদিকে নাইজেরিয়া এই সুযোগের ব্যবহার করতে পারেনি বলেই সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এই পরিস্থিতি আমলে নিয়ে একটি প্রশিক্ষিত, উৎপাদনশীল ও কর্মমুখী তরুণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনে করে, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষিত তরুণদের চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হবে। সার্টিফিকেট নির্ভর পড়ালেখার বিকল্প হিসেবে কর্মমুখী শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে হবে। অভিরুচি, সামর্থ্য, মেধা ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে। কারিগরি শিক্ষা, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মানবসম্পদকে বিকশিত করা সম্ভব। শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে। ছাত্রদল মনে করে, অগ্রসর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও তথ্য প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব। উচ্চতর পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উপর জোর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বমানে পৌঁছানোর আবশ্যকীয়তাকে ছাত্রদল গুরুত্ব প্রদান করে।

সংস্কৃতি একটি জাতির মুখচ্ছবি। সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে জাতির মনন ও রুচির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাংস্কৃতিকভাবে প্রতিবন্ধী জাতি কখনোই বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনে করে, জাতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ গড়ে উঠবে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে। সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্য হবে দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, জাতির আত্মপরিচয় এবং নির্মল বিনোদনের পরিবেশ তৈরি করা। বহিঃর্বিশ্বের যা কিছু কল্যাণকর কেবল সেসব উপাদানই জাতীয় সংস্কৃতিতে সমন্বিত করা যাবে। অনৈতিক আকাশ সংস্কৃতি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করতে হবে। জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সংগীত, নৃত্যকলা, নাটক, সাহিত্য চর্চা ও চলচ্চিত্র সহ সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে অধিকহারে সমৃদ্ধ করতে হবে। ছাত্রদল জাতীয় ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহিত করে। ছাত্রদল মনে করে, শিক্ষাঙ্গনগুলোতে উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী সমৃদ্ধ সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমেই একটি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ তরুণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ছবি: নতুন কুঁড়ি অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে নারীর ভূমিকা অসামান্য। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশ পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি সর্বপ্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দিয়েছিলেন। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ এ উন্নীত করেছিলেন। তার মন্ত্রীসভায় একাধিক নারী মন্ত্রী ছিলেন। নারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের একক দায়িত্ব দিয়ে ১৯৭৮ সালে জিয়া মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের এই ধারায় বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলেও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। বিশেষ করে, দশম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করার মতো যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল খালেদা জিয়ার সরকার। ছাত্রদল জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়া সরকারের নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের এই প্রক্রিয়াকে ধারণ করে। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে ছাত্রদল নারী শিক্ষার্থীদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করে। ছাত্রদল সংগঠনে নারীদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মূল্যয়নের চিন্তা করে। রাজনীতিতে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বাঁধা অপসারণে ছাত্রদল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মাদক সমস্যা বর্তমান বাংলাদেশে একটি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে বিস্তার করেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও এর ছোঁয়া লেগেছে। ছাত্রলীগ নেতাদের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাদকের সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। মাদকের এই মরণ ছোবল থেকে কিশোর ও তরুণ সমাজকে মুক্ত করার জন্য ছাত্রদল সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মাদক ব্যাবসায়ীদের সিন্ডিকেট

প্রতিরোধ এবং মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ছাত্রদল অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক চেতনাকে সামনে রেখেই ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ছাত্রদল মনে করে, রাষ্ট্রের উচ্চস্তরে গণতান্ত্রিক চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেশের সকল বিদ্যাপীঠে গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে হবে। মুক্ত রাজনৈতিক চর্চার অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ চালু করা আবশ্যক। ছাত্রদল মনে করে, ছাত্র সংসদগুলো মেধাবী নেতৃত্ব তৈরির সূতিকাগার। অবাধ, সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক পরিবেশে ডাকসু সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা গেলে এদেশের মেধাবী তরুণ সমাজ জাতীয় রাজনীতিতে অবদান রাখতে পারবে। এই প্রক্রিয়াকে নিশ্চিত করা গেলে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িয়ে থাকা, দুর্নীতি, অপশাসন রোধ করে একটি জনমতের প্রতিফলনভিত্তিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল মনে করে, বিগত পনেরো বছরেরও অধিক সময় যাবত স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের আমলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যে ঘুণ ধরেছে তার সংস্কারে মেধাবী তরুণদের সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে। দেশ গঠনের এই মহতি প্রচেষ্টায় সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে ছাত্রসমাজকেই। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের আন্দোলন, সংগ্রামের সোনালী অতীত থেকে প্রেরণা নিয়ে তরুণ প্রজন্মকেই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ছাত্রদল বিশ্বাস করে, মেধাবী ও সৃজনশীল তরুণরাই এদেশের ভবিষ্যত। তাদের হাত ধরেই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পুনঃবিকাশ সম্ভব। তরুণ প্রজন্মের হাত ধরেই যেমন ফ্যাসিবাদের নিকষ অন্ধকার থেকে বাংলাদেশের মুক্তি ঘটেছে, ঠিক তেমনই আগামী দিনগুলোতে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় ছাত্রসমাজকে সর্বাগ্রে থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে।

আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

প্রচার সম্পাদক শরীফ প্রধান শুভ কর্তৃক প্রচারিত এবং
সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মিনহাজ আহমেদ প্রিন্স কর্তৃক প্রকাশিত